বাস্তবতার এক বিশেষ রসাস্বাদও ঘটতে পারে। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে মন্তব্য করে গিয়েছেন অদ্যাবধি তার গুরুত্ব অস্বীকার করবার নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে দীনবন্ধুর সহানুভূতি এবং অভিজ্ঞতা যেখানে সমন্বিত হয়েছে সেখানেই সৃষ্টি সার্থকতা লাভ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের মতটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, "দীনবন্ধুর এই দুটি গুণ—(১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্বব্যাপী সহানুভূতি……যেখানে এই দুইটির মধ্যে একটির অভাব হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার কবিত্ব নিষ্ফল হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার প্রধান প্রধান নায়ক-নায়িকা (hero এবং heroine), তাহাদিগের চরিত্র যে তেমন মনোহর হয় নাই, ইহাই তাহার কারণ। আদুরী বা তোরাপ জীবন্ত চিত্র, কামিনী বা লীলাবতী, বিজয় বা ললিতমোহন সেরূপ নয়। সহানুভূতি আদুরী বা তোরাপের বেলা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ভাষা পর্যন্ত আনিয়া কবির কলমের আগায় বসাইয়া দিয়াছিল; কামিনী বা বিজয়ের বেলা, লীলাবতী বা ললিতের বেলা, চরিত্র ও ভাষা উভয় বিকৃত কেন? যদি তাঁহার সহানুভূতি স্বাভাবিক এবং সর্বব্যাপী তবে এখানে সহানুভূতি নিষ্ফল কেন? কথাটা বুঝা সহজ। এখানে অভিজ্ঞতার অভাব। প্রথমে নায়িকাদের কথা ধর। লীলাবতী বা কামিনীর শ্রেণীর নায়িকা সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ছিল না, কেন না, কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙ্গালা সমাজে ছিল না বা নাই।……দীনবন্ধু ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটক নবেল ইত্যাদি পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে বাঙ্গালা কাব্যে বাঙ্গালার সমাজস্থিত নায়ক নায়িকাকেও সেই ছাঁচে ঢালা চাই। কাজেই যাহা নাই, যাহার আদর্শ সমাজে নাই, তিনি তাহাই গড়িতে বসিয়াছিলেন। …তাঁহার চরিত্র প্রণয়ন প্রথা এই ছিল যে জীবন্ত

আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আঁকিতেন। এখানে জীবন্ত আদর্শ নাই, কাজেই ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যগত মৃৎ পুত্তলগুলি দেখিয়া, সে চরিত্র গঠন করিতে হইত। জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে নাই, কাজেই সে সর্বব্যাপিনী সহানুভূতিও সেখানে নাই। কেননা সর্বব্যাপিনী সহানুভূতিও জীবন্ত ভিন্ন জীবনহীনকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না— জীবনহীনের সঙ্গে সহানুভূতির কোন সম্বন্ধ নাই।”

বঙ্কিমচন্দ্রের দীনবন্ধু বিষয়ক সমালোচনাটি বাংলা সমালোচনার সম্পদ বিশেষ। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা একটু বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিলাম, কারণ এরই আলোকে দীনবন্ধুর মূল শিল্পী-প্রাণের কিছু গভীর পরিচিতি লাভ সম্ভব বলেই। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর সহানুভূতির ও অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। তাঁর সহানুভূতিকে বলেছেন সর্বব্যাপী। শুধুমাত্র অনভিজ্ঞতার রাজ্যে তা পৌঁছতে পারে না। কিন্তু অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন, “যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত— সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। তাঁহার লীলাবতী, মালতী, কামিনী, সৈরিন্ধ্রী, সরলা প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয়া নহে। তাঁহার বিনায়ক, রমণীমোহন, অরবিন্দ, ললিত-মোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত, তাহা তাঁহার ইঙ্গিতমাত্রেরও অধীন। ওঝার ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণমাত্র সারি দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।” অর্থাৎ দীনবন্ধুর শিল্পী-মন সর্বত্র সমান উল্লসিত হয় না। তা হলে তাঁর শিল্পী-সহানুভূতিকে সর্বব্যাপী বলা যায় না। এক্ষেত্রে একটি শিল্পতত্ত্বঘটিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসে যায়। ব্যক্তিগত সহানুভূতি এবং শিল্পীপ্রাণের সহানুভূতিকে একাকার করে ফেললে মূলত কতকগুলি ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আশঙ্কা থেকে যায়। ব্যক্তিগতভাবে কবির মন যেদিকে আকৃষ্ট হয়, তাঁর শিল্পীপ্রাণ সেদিকে কিছুমাত্র আকর্ষণ না-ও বোধ

করতে পারে। নবীনমাধবের ন্যায় আদর্শবান যুবকের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর শ্রদ্ধা তথা সহানুভূতি থাকবার কথা। অপরপক্ষে গোপী নায়েব বা পদীময়রাণী বা রোগসায়েবের প্রতি তাঁর সচেতন চিত্তের সহানুভূতি নয়, ঘৃণা থাকাই সম্ভব। নীলদর্পণ নাটকের সচেতন পরিকল্পনায় ব্যাপারটা তাই-ই ছিল। কিন্তু দীনবন্ধুর চিত্তের গভীরে বসে তাঁর শিল্পীপ্রাণ অন্যভাবে সব কিছুকে বিন্যস্ত করেছে। নবীন-মাধবের প্রতি তাঁর শিল্পীপ্রাণ সহানুভূতি বোধ করে নি, রোগ সাহেবদের প্রতি করেছে, বিস্ময়কর হলেও ব্যাপারটি সত্য।

বঙ্কিমচন্দ্র এক স্থানে বলতে চেয়েছেন যে নবীনমাধবের ন্যায় দেশপ্রাণ সর্বহিতৈষী যুবক আমাদের সমাজে বড় দেখা যায় না। কাজেই দীন-বন্ধুর এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না; এক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণ তাই। কিন্তু নবীনমাধবদের ন্যায় যুবক বাংলা দেশে দেখা যায় না একথা সত্য নয়। ললিত-লীলাবতীর মত তারা রোমান্সের রাজ্যের লোক নয়। সৈরিন্ধ্রী, সরলতা, সাবিত্রী তো ঘরেরই মেয়ে। বাঙালির সংসারে নিত্য নিত্য এদের প্রাণলীলা এই একই ভাবে তরঙ্গিত। সেখানেও দীনবন্ধুর সৃষ্টিতে সাফল্যের স্পর্শ লাগল না কেন—এর উত্তর দিতে গেলে শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার অভাবের দোহাই দেওয়াই যথেষ্ট নয়। আসলে দীনবন্ধুর শিল্পীপ্রাণ এসব ক্ষেত্রে জেগে ওঠে নি। কিন্তু কেন?

দীনবন্ধু বাস্তবধর্মী নাট্যকার। কল্পনার রাজ্যে তাঁর পরিক্রমা বাধাহীন নয় এবং রহস্যবিজড়িত অস্পষ্টতা, বর্ণবিকিরিত বিহ্বলতা, আলোছায়ার বিচিত্র লীলার জগতে তাঁর প্রবেশ ছিল না। অর্থাৎ সাহিত্যিক হিসেবে তিনি আদৌ রোমান্টিকধর্মী ছিলেন না। কিন্তু দীনবন্ধুর রিয়ালিজমেও অনন্ত ব্যাপকতা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলেছেন সূক্ষ্ম, কোমল ও ললিতে তাঁর অধিকার ছিল না। কিন্তু সূক্ষ্ম,

কোমল ও ললিত বাস্তব পৃথিবীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। দীনবন্ধুর এই বিশিষ্ট প্রবণতার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তাঁর বাস্তবতাবোধ সৃষ্টির সর্বত্র প্রসারিত ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত অভিজ্ঞতা কথাটিকে এক্ষেত্রে বাস্তবতাবোধ বলে গ্রহণ করা চলে। দেখা যায় অভিজ্ঞতারও সর্ব প্রদেশে তাঁর শিল্পী-সহানুভূতি বিস্তৃত নয়। অভিজ্ঞতা আছে অথচ সহানুভূতি নেই, এমন উদাহরণ তাঁর রচনায় অল্প নয়। দীনবন্ধুর সৃষ্টিতে সাফল্য সেখানেই এসেছে যেখানে তাঁর শিল্পীপ্রাণের সহানুভূতির আলো পড়েছে। কিন্তু তাঁর শিল্পীপ্রাণ কল্পনা রাজ্যে প্রবেশ করতে চায় নি। বাস্তব জগতেরও সর্বত্র সে পরিক্রমা করতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু কেন? এর উত্তরের মধ্যেই তাঁর শিল্পী-আত্মার রহস্যের সন্ধান মিলবে।

উনবিংশ শতকে আমাদের দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর জীবনে ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে এক তরঙ্গিত চাঞ্চল্য জেগেছিল। হৃদয়ের মুক্তিকে বাঙালি বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সেদিন নানাভাবে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। ভালমন্দের সহজ সীমারেখা ডিঙ্গিয়ে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের রহস্য ও মহিমা উদ্ধারের সাধনা সেদিন সাহিত্যে ও চিন্তায় বিস্তৃত হয়েছিল। ক্ষীণপ্রাণ নির্জীব মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রা সেই নব-জাগরিত প্রাণস্পর্ধাকে তৃপ্ত করতে পারে নি। ইংরেজী স্কুলে পাঠ গ্রহণ করায় সে দেশের মানবজীবনে কর্মচাঞ্চল্যের যে গতি ও প্রবলতা নিত্য অনুভূত তার আস্বাদলাভে বাঙ্গালি সেদিন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। এই ব্যাকুলতা মধুসূদনকে নিয়ে গিয়েছিল পৌরাণিক কল্পনার পর্বতচূড়ায়, মহাকাব্যিক জীবনবোধের প্রবল বিস্তারে। বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সের রাজ্যে, মধ্যযুগের ইতিহাসের বীর্যবত্তায় প্রাণের উল্লাসের সন্ধান করেছিলেন। দীনবন্ধুর ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি আকাশচারী ডানাকে আয়ত্ত করতে পারে নি;

মাটির পৃথিবীতেই তাঁকে চলতে হয়েছে। এই ভূমিপ্রাণতাই তাঁকে নিয়ে গিয়েছে সে সব মানুষের কাছে যারা ভদ্র নয়, সভ্য নয়, মার্জিত নয় ; কিন্তু যেখানে জীবন-তরঙ্গ প্রবল বেগে দক্ষিণে-বামে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে, শ্লীলতা, রুচিবোধে, শিক্ষার তটরেখা যেখানে প্রতি মুহূর্তে আহত হচ্ছে, কিন্তু জীবনের সে সহজ উল্লাস, সহজ আর্তনাদ, সহজ ভীতির বিচিত্র আস্বাদ মনে অনপনেয় তুফান তুলেছে। বিহারীলাল নগর থেকে দূরে গিয়ে চাষার সরল জীবনের সান্নিধ্য কখনও কখনও চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে ক্বচিৎ বাসনা জেগেছে—

হেলায়ে মাথা, দাঁতের আগে
মিষ্ট হাসি টানি
বলিতে আমি পারিব না তো
ভদ্রতার বাণী।
উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি
বক্ষতল ফেলিছে গ্রাসি,
প্রকাশহীন চিন্তারাশি
করিছে হানাহানি।
কোথাও যদি ছুটিতে পাই
বাঁচিয়া যাই তবে,
ভব্যতার গণ্ডি মাঝে
শান্তি নাহি মানি।

কিন্তু দীনবন্ধু তাদের খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর মন সেখানে বাসা বেঁধেছিল। মাটির কাছের মানুষের ভাষা ও আশা দীনবন্ধুর মন ভরে দিয়েছিল।

কিন্তু তখনও সময় হয় নি। মহাকাল বহু শক্তিগর্ভ শিল্পীকে

আপন খেলার পুতুল করে। ভারতচন্দ্র এবং দীনবন্ধু শক্তিশালী সাহিত্যিক হয়েও স্বল্প সাফল্যই পেয়েছেন। ইতিহাস তাঁদের বিরুদ্ধতা করেছে। সময়ের কিছু আগে এঁদের আবির্ভাব হয়েছিল অথচ কালের কেশর চেপে তাকে বশীভূত করবার মত প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারীও তাঁরা ছিলেন না। দীনবন্ধু কর্মশীল সাধারণ মানুষকে সাহিত্যের রাজাসন দিতে চেয়েছেন উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। কিন্তু তখনও মানুষের স্থান সাহিত্যে নিশ্চিত স্থিতি পায় নি। স্মরণ রাখা উচিত তখনও 'মেঘনাদবধ' প্রকাশিত হয় নি—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসের সৃষ্টিকাল আরও বহু দূরে। বাংলা সাহিত্যে মানুষের স্থান একটা চমৎকার পারম্পর্য ধরে এগিয়েছে। পৌরাণিক দেবতা, দেবকল্প মানব ও দানবদের স্থানে ধীরে ধীরে ইতিহাসের রাজা রাজড়ারা এসেছে, অভিজাতেরা তার পরে স্থান করে নিয়েছে, মধ্যবর্গীয় বুদ্ধিদৃপ্ত ব্যক্তিত্ব, পরিবারজীবনের স্নেহসিক্ত মাতৃত্ব ক্রমে এসেছে। অবশেষে বিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে মজুর-কৃষকেরা রাজাসন পাচ্ছে। পূর্ববর্তী শতকে এদের প্রহসনে স্থান দেওয়া চলত, কোন গম্ভীর ভাবের রচনার কেন্দ্রে বসান যেত না। এ বাধা শুধু বাইরের নয়। দীনবন্ধু সেকালের শিক্ষায় ও চিন্তায় দীক্ষিত। এ বাধা তাঁর মনেরও। ফলে দীনবন্ধু যাদের কথা বলতে গেলেন নীলদর্পণে, তারা মুখ্য ভূমিকা পেল না। নীলদর্পণেই শিল্পী দীনবন্ধুর আত্মিক সঙ্কট চরমে উঠল। এই আঘাত শুধু নীলদর্পণকেই আংশিক সাফল্য ও প্রচুর ব্যর্থতায় মণ্ডিত করল না, তাঁর নাট্যকার জীবনের ধারাকেও পরিবর্তিত করল। দীনবন্ধু 'নীলদর্পণে'র পরে আর 'সিরিয়াস' সামাজিক নাটক বড় লেখেন নি। 'লীলাবতী'তে রোমান্স-ধর্মী নাট্যরচনার ব্যর্থ চেষ্টা চলেছে, 'নবীন তপস্বিনী' প্রভৃতি রচনাও

কিছুমাত্র সাফল্য অর্জনে সমর্থ হয় নি। দীনবন্ধুর শিল্পীপ্রতিভা নীলদর্পণের পরবর্তীকালে মনে মনে বরণ করে নিল লঘুরস প্রহসনকে। দীনবন্ধু বাস্তববাদী শিল্পী। কৌতুকের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ চিরকালের। নীলদর্পণের বেদনার অশ্রুতেও তা ক্বচিৎ সূর্যালোক প্রতিফলিত করেছে। কিন্তু তা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা অনুচিত যে বেদনার রাজ্যে তাঁর সহজ অনুপ্রবেশ ছিল না। তা হলে ক্ষেত্রমণির মৃত্যুর দৃশ্যে প্রাণের সুর অত গভীর হয়ে বাজত না।

রিয়ালিষ্ট দীনবন্ধু বেদনা ও কৌতুকের সমবায়ে গড়ে ওঠা তথাকথিত নিম্নস্তরের কর্মশীল মানুষের জীবনের কবি হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নীলদর্পণে অনুভূত তাঁর আত্মিক সঙ্কট শেষ পর্যন্ত তাঁকে করে তুলল একজন সফল প্রহসনকার। বলা যেতে পারে, শিল্পীপ্রতিভা যে রাজ্যে তাঁকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল তাতে প্রতিহত হয়ে (এই প্রতিহত হবার চিহ্নে নীলদর্পণ নাটকের সর্বাঙ্গ বিক্ষত) তিনি প্রহসনের জগতে আশ্রয় নিলেন। 'সধবার একাদশী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'জামাইবারিক' তাঁর নীলদর্পণ ব্যতীত অন্য যে কোন নাটকের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। এ তিনটিই প্রহসন। এ তিনটিতেই ভদ্রলোকদের নিয়ে কৌতুক-হাস্যে মেতে উঠেছেন দীনবন্ধু। তাদের জীবন, চরিত্র ও শিক্ষার বিচিত্র অসঙ্গতিতে আঘাত করে প্রভূত হাস্যরস তিনি বর্ষণ করলেন। ভদ্রসমাজকে নিয়েই যখন লিখতে হবে (এ নির্দেশ শুধু বাইরের নয়, দীনবন্ধুর অন্তরও এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে পারে নি, প্রথার কাছে মনে-প্রাণে আত্মসমর্পণই করেছে।) তখন প্রহসনই লেখা যেতে পারে—অন্য কিছু নয়। কিন্তু দীনবন্ধুর প্রহসনেও আক্রমণের জ্বালা তীব্র নয়, সিনিসিজম অনুপস্থিত। ভদ্রসমাজকে তাঁর শিল্পীপ্রাণ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে নি, কিন্তু কৃষকদের ভালবেসে তিনি সবাইকে ভালবেসেছেন—মানুষকে ভালবেসেছেন। তাঁর ব্যঙ্গ তাই অশ্রুর স্পর্শবর্জিত নয়।

॥ পাঁচ ॥

নাটক অভিনয়ে গ্রাহ্য। কিন্তু সাহিত্যকর্ম হিসেবে বিচারকালে নাটকের ভাষা অর্থাৎ সংলাপের ভাষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কোন চরিত্র-সৃষ্টিই শেষ পর্যন্ত সার্থক বলে বিবেচিত হবে না যদি না তার সংলাপে প্রাণের স্পর্শ অনুভূত হয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিফলিত হয়।

দীনবন্ধুর নীলদর্পণের সংলাপের ভাষা একদিকে উল্লেখ্য সাফল্য এবং অন্যদিকে গুরুতর ব্যর্থতা বহন করছে। একদিকে তাঁর সংলাপের ভাষা অকৃত্রিম, জীবন্ত এবং ব্যক্তিস্বভাবকে স্পষ্টত ধরে রেখেছে, অন্যদিকে তা জড় ও কৃত্রিম বলে মনে হয়েছে। দীনবন্ধুর শিল্পীপ্রাণের যে ব্যাখ্যা পূর্ব অধ্যায়ে আমরা করেছি এর কারণও তার মধ্যে মিলবে। দীনবন্ধুর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তোলা যাবে না যে ভাষার উপরে দখল না থাকায় তাঁর কোন চরিত্রকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। তাঁর চরিত্রবোধ যেখানে সার্থক, ভাষাও সেখানে ত্রুটিহীন। কারণ যুগপৎ এ উভয়ের জন্ম ঘটেছে শিল্পীঅন্তরে। প্রাচীন আলঙ্কারিকদের ভাষায়—এদের মধ্যে আছে অপৃথক্‌যত্নসম্পাদ্যতা। যেখানে ভাষার ব্যর্থতা, সেখানে চরিত্রকল্পনার ভিত্তিতেও প্রাণরসের অভাব লক্ষিত হয়। সংলাপসহ নীলদর্পণের চরিত্রগুলির কিছু পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

নবীনমাধবকে এ নাটকের নায়করূপে উপস্থিত করা হয়েছে। নায়কোচিত গুণ তার মধ্যে আছে কিনা এ প্রশ্ন তোলা যায়। নায়কের মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট্য, চরিত্রলক্ষণ থাকবেই এরূপ কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম একালের কোন লেখক-সমালোচকই মানেন না। কোন নাটকের নায়ক রচনাটির মধ্যে প্রাধান্য পাবে আপনার চরিত্র-বৈশিষ্টে তার কর্ম নাট্য-ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করতে চাইবে। অন্তত তার হৃদয় নাট্যঘটনার দ্বারা আলোড়িত হবে, এটি একান্ত প্রত্যাশিত।

নবীনমাধব মানুষ ভালোই ছিলেন। অনেক সৎকর্মানুষ্ঠান তিনি করেছেন এবং অনেক সৎকর্মানুষ্ঠান ভবিষ্যতে তাঁর দ্বারা সাধিত হতে পারে এরূপ ভাবার অবকাশ আছে। তিনি পরোপকারী ব্যক্তি। সাধুচরণকে বাঁচাবার চেষ্টায় বা ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করায় তার প্রমাণ মিলেছে। কিন্তু নবীনমাধবকে মুখ্য পাত্ররূপে দাঁড় করিয়ে নীলকরদের বিরুদ্ধশক্তি সৃষ্টি করে নাট্যদ্বন্দ্ব রচনা করা আদৌ সম্ভব ছিল না। নবীনমাধবের চরিত্রে দৃঢ়তা সম্ভবত ছিল, কিন্তু ইংরেজ অত্যাচারীর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কঠিন বিরোধিতা করা সেকালের শিক্ষিত ভদ্র সন্তানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ তা বাদ দিয়ে নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা কঠিন হয়ে পড়ে। নবীনমাধবকে নায়ক দাঁড় করায় নীলদর্পণের নাট্যদ্বন্দ্ব একান্ত শিথিল হয়ে পড়েছে।

নবীনমাধবের চরিত্রে নানা গুণের সমবায় ঘটিয়েছেন নাট্যকার। কিন্তু সমস্ত গুণের অন্তরালবর্তী যে অনির্বাচ্য শক্তি সব কিছুকে জীবন্ত ও বিশ্বাস্য করে তোলে—যার নাম প্রাণশক্তি তার অভাবে নবীনমাধব ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। নবীনমাধবের ভাষা একান্তভাবেই বাঁধা পুঁথির গৎ থেকে সঙ্কলিত। যেমন—

"আজ্ঞে, জননীর পরিতাপ বিবেচনা করে্য কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সঙ্কুচিত হয়? আমি অনেক স্তুতিবাদ করিলাম, তা তিনি কিছুই বুঝিলেন না। সাহেবের সেই কথা, তিনি বলেন ৫০ টাকা লইয়া ৬০ বিঘা নীলের লেখাপড়া করিয়া দাও, পরে একেবারে দুই সনের হিসাব চুকাইয়া দেওয়া যাইবে।"

এ ভাষায় কি হৃদয়ের কোন উত্তাপ প্রতিফলিত হয়েছে? এ ভাষায় কি কোন প্রাণ আছে? ক্ষেত্রমণিকে রোগ সাহেবের কবল থেকে উদ্ধার করবার সময়েও নবীনমাধবের ভাষায় ক্রোধ আদৌ জ্বলে ওঠে নি,—

"রে নরাধম নীচবৃত্তি নীলকর, এই কি তোমার খ্রীষ্টানধর্মের জিতেন্দ্রিয়তা? এই কি তোমার খ্রীষ্টানের দয়া, বিনয়, শীলতা? আহা, আহা, বালিকা, অবলা, অন্তর্বত্নী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দয় ব্যবহার।"

দীনবন্ধুর নীলদর্পণের ভদ্র চরিত্রগুলির সংলাপ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা মনে হয়।

এক। সংলাপ ভদ্র চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে জীবন্ত হয়ে ওঠে নি। কারণ দীনবন্ধুর প্রাণের সাড়া এ সব চরিত্রের উৎসে নেই।

দুই। সংস্কৃত নাটকে ভাষা ব্যবহারে অনেকটা এ ধরনের রীতিই প্রচলিত ছিল। আলঙ্কারিক বাক্যের ব্যবহারে তা ছিল রীতিমত ভারাক্রান্ত। ঠিক নাটকীয় সংলাপ বলতে আমরা যা বুঝি সংস্কৃত নাটকের ভাষা আদৌ সেরূপ ছিল না। দীনবন্ধু এক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটকের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। সংস্কৃত নাটকে ভদ্র চরিত্রগুলি সংস্কৃতে এবং অভদ্র চরিত্রগুলি নানারূপ প্রাকৃতে কথা বলত। দীনবন্ধুও ভদ্রেতর চরিত্রের মুখে কথ্য ভাষা এবং ভদ্র চরিত্রের মুখে সংস্কৃতানুগ সাধু ভাষা বসিয়ে অনুরূপ স্বাতন্ত্র্য সূচিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রাণবন্ত নাট্যরূপ সৃষ্টিতে সে চেষ্টা একেবারে ফলপ্রসূ হয় নি। সংস্কৃত রীতিরই অনুসরণে মাঝে মাঝে কবিতার সংযোগ ঘটিয়ে তিনি সংলাপকে জড় শব্দপিণ্ডে পরিণত করেছেন,—নাট্যরসের সম্ভাবনাকে পর্যন্ত বিনষ্ট করেছেন। নাট্যসমাপ্তিতে বিন্দুমাধবের দীর্ঘ বক্তৃতা তার প্রমাণ।

তিন। অবশ্য দীনবন্ধুর পক্ষেও কিছু বলবার আছে। বাংলা গদ্যভাষার যে রূপ তখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে দীনবন্ধুকে খুব দোষ দেওয়া চলে না। বিদ্যাসাগরের সুললিত গদ্যও

নাট্যসংলাপরূপে ব্যবহৃত হলে যে একান্তভাবেই জড় ও হাস্যকর হয়ে উঠত, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ভদ্র চরিত্রগুলির মধ্যে গোলক বসুর গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা কিছু চমকের সৃষ্টি করে। তবে নাটকীয় চমকের এখানে সবে সূত্রপাত। গোলক বসুর চরিত্রের যে সামান্য পরিচয় পূর্বে মিলেছে, সাধু ভাষার জড় আবরণ ভেদ করে যতটুকু পূর্বে বুঝা গিয়েছে তাতে মনে হয় তিনি অত্যন্ত নির্বিরোধী শান্তচিত্ত ভদ্রলোক। কারাবাসের হুকুম পেয়ে তাঁর পক্ষে ভেঙে পড়া অসম্ভব নয়। মানসিক ভারসাম্য হারাবার ফলে আত্মহত্যাও খুব অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না।

বিন্দুমাধবের আচরণে কিন্তু কোথাও ঘটনাগত চমক সৃষ্ট হয় নি। সে সর্বদাই সঙ্গত আচরণ করেছে। তবে তাকে নাট্যকার প্রধানত একটি প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন। পিতার মৃত্যু, ভ্রাতার মৃত্যু, মাতার উন্মাদরোগ, পত্নীর মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখকর ঘটনার আঘাতগুলি তার বুকেই প্রধানত লেগেছে। তার হা হুতাশে তাই এ নাটক পরিপূর্ণ। নবীনমাধবের মৃত্যুর পরে বুক পেতে দুঃখ বহন করবার মত একটি ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল। সেই ব্যক্তি বিন্দুমাধব। নাটকে তার কর্ম সামান্যই, হা হুতাশে ভরা সংলাপই বেশি এবং সে সংলাপ ভাষার আড়ম্বরে, অলঙ্করণে, সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্যে, গদ্যে-পদ্যে জড়িয়ে সম্পূর্ণত শিল্পমূল্য বর্জিত এবং প্রাণরস বঞ্চিত।

গোলক বসুর পরিবারের নারীচরিত্রগুলি এত সাধারণ যে তাদের সম্পর্কে বলবার কিছুই নেই। প্রাত্যহিক ঘরসংসারের কথায়, ক্ষুদ্র রসিকতায়, সামান্য মন্তব্যে তাদের চরিত্রে, সাধুভাষার আড়ষ্টতার ফাঁক দিয়ে মামুলি হলেও, কিঞ্চিৎ প্রাণলক্ষণ ব্যক্ত হয়েছে। যেমন,—

"সরলতা। দিদি এ মাসের আর কদিন আছে গা—

সৈরীন্ধ্রী। (হাস্যবদনে) যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। ঠাকুরপোর কলেজ বন্ধ হলে বাড়ী আসবের কথা আছে—তাই তুমি দিন গুণচো—আর বোন, মনের কথা বেরুয়ে পড়েছে।

সর। মাইরি দিদি আমি তা ভেবে জিজ্ঞাসা করি নি—মাইরি।"

কিন্তু যখনই সংলাপ হৃদয়ের কোন গভীর ভাব বা আবেগ প্রকাশ করতে গিয়েছে তখনই কৃত্রিমতার ভারে তা জড়তাপ্রাপ্ত হয়েছে। যেমন—

"সরলতা। সরলা ললনা জীবন এল না;
কমল হৃদয় দ্বিরদ দলনা॥

বড় আশায় নিরাশ হলাম। প্রাণেশ্বরের আগমন প্রতীক্ষায় নব-সলিলশীকরাকাঙ্ক্ষিণী চাতকিণী অপেক্ষাও ব্যাকুল হয়ে ছিলাম।......"

কবিতাংশের সংযোগে এর স্বাভাবিকতা আরও বিনষ্ট হয়েছে। কিংবা সাবিত্রীর এই উক্তি—

"সতীত্ব সোনার নিধি বিধিদত্ত ধন।
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এমন রতন॥

যদি নীল বানরের হস্ত হইতে পবিত্র মাণিক্য অপবিত্র না হইতে হইতে আনিতে পার, তবেই তোমাকে সার্থক গর্ভে স্থান দিয়াছিলাম।"

কতই অস্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু এই সাবিত্রীর যখন মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটল তখন তার ভাষায় যেন প্রাণের স্পর্শ লাগল।—

"সাবিত্রী। (কবিরাজকে) তুই আঁটকুড়ির বেটা কুটির নোক, তা নইলে ভাল মানুষের মেয়ের হাত ধত্তে চাচ্চিস্ কেন, (গাত্রোত্থান করিয়া) দাইবউ, ছেলে দেখিস্ মা, আমি জল খেয়ে আসি, তোরে একখানা চেলির শাড়ী দেব।"

এই প্রসঙ্গে নীলদর্পণ নাটকের ট্রাজিকরস সৃষ্টির সাফল্যের বিচার করা যেতে পারে। এই নাটক সার্থক ট্রাজেডিরূপে কিছুতেই গ্রাহ্য হতে পারে না। অবশ্য তার অর্থ এ নয় যে দীনবন্ধু ট্রাজেডির গম্ভীর শুষ্ক বেদনা সৃষ্টিতে আকর্ষণ বোধ করতেন না, লঘু তরল হাস্যরসই তাঁর প্রকৃত মনের রাজ্য। ক্ষেত্রমণির মৃত্যুদৃশ্যের বেদনাদীর্ণ চিত্রাঙ্কনের অতি-দুর্লভ সাফল্য তার বিরুদ্ধে প্রমাণ দেবে। কিন্তু তবুও নীলদর্পণ নাটক ট্রাজেডি হয়ে ওঠে নি, প্রধানত নিম্নোক্ত কারণগুলির জন্য,—

এক। নাট্যকারের মনোভাব এবং সৃষ্টি এ নাটকে আদৌ সমন্বিত হয় নি। এ নাট্যরচনায় দীনবন্ধু যে একটা আত্মিক সঙ্কট অনুভব করছিলেন তার পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। এই দ্বিধাদীর্ণ মনোভাব নিয়ে সফল ট্রাজেডি রচনা করা স্রষ্টার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

দুই। নবীনমাধবের ন্যায় ভাল মানুষ দেশসেবককে নিয়ে ইংরেজ কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে একটা প্রাণপূর্ণ শক্তিকেন্দ্র তৈরী করে তোলা সম্ভব নয়। বাস্তব জীবনে নীলচাষীদের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা নবীনমাধবের ছিল না, অল্পস্বল্প উপকার করার ক্ষমতা থাকতে পারে। যে নাটকের মূল ভাববীজ নীলচাষীদের জীবনের ট্রাজেডির দিকে নিয়ে যায় তার নায়কত্ব ধারণ করার শক্তি নবীনমাধবের ছিল না। সমগ্র গ্রাম বাংলার কৃষক সমাজের ট্রাজেডিকে ধরে রাখবার উপযোগী চারিত্রিক দৃঢ়তা, ব্যাপ্তি বা গভীরতাও নবীনমাধবের ছিল না।

তিন। নবীনমাধব স্বরপুর গ্রামের গোলক বসুদের পরিবারের বিপর্যয়ের কেন্দ্রস্থ ব্যক্তি হতে পারেন—তার অধিক নয়; কিন্তু এ নাটকে নবীনমাধব একবারও নিজের মনের গভীরে ফিরে তাকান নি। যা কিছু আঘাত এসেছে তা বাহিরের। অন্তরে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা গভীরতর জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলবার কোন সুযোগ বর্তমান নাটকের নেই।

চার। বহু দুঃখজনক ঘটনার পুঞ্জীকরণ লেখকের উদ্দেশ্য প্রবণতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। এর প্রতিটি ঘটনাকে অনিবার্য বলে মেনে নেওয়া চলে না। অন্তত সরলতার মৃত্যু যে আকস্মিক এবং অনপেক্ষিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোন চরিত্রের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়ে তাকে দিয়ে খুশিমত যা কিছু করিয়ে নেওয়া সম্ভব। এটি কৌশল হিসেবে অতি সস্তা।

ট্রাজেডি হিসেবে নীলদর্পণ শেষ পর্যন্ত সার্থক হয় নি। অবশ্য অন্তত একটি দৃশ্যের তীব্র করুণ রসাত্মক আবেদন পাঠকচিত্তে সহজে পৌঁছেছে। সেটি হল ক্ষেত্রমণির মৃত্যুদৃশ্য। নবীনমাধবের মৃত্যুদৃশ্যের বেদনার আবেদন আমাদের হৃদয়কে খুব গভীরভাবে স্পর্শ করে না, গোকুল বসুর আত্মহত্যার ফলে যে বেদনার সঞ্চার হতে পারত তা বিন্দুমাধবের ভাষার কৃত্রিমতায় ব্যর্থ হয়েছে।

নীলদর্পণের ভদ্র জীবনের অংশ সম্বন্ধে বলা চলে যে এ নাটকে ট্রাজেডি সৃষ্টির চেষ্টা বিফল হয়েছে, করুণ রসোদ্রেককারী ঘটনা অনেক আছে, কিন্তু বেদনা কিছু মাত্র সৃষ্ট হয় নি।